



## Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.147-162

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

### বৈচিত্র্যের ঐক্য সাধনায় গান্ধি ও তাঁর ভারতবর্ষ

ড. অজয় কুমার দাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ভারত

#### Abstract:

*He is Gandhi, the immortal soul, who used non-violence as the weapon in the freedom movement of India, who tried to sanctify the human society through peace, tenderness of heart. He was the new messenger of the doctrine of non-violence of Mahavir, Buddha, Christ and Chaitannya. Principles of Christ had a deep influence on him. Christ taught humanity the lesson of tolerance, devoting his own life. India is a land of diversity. Innumerable differences are there in India - in caste, religion, language and culture. In spite of that, Indianness is our identity. Gandhiji thought that unity in diversity is possible through innate wisdom and vision of truth. Gandhiji sought for universal humanity instead of narrow nationalism. India to him was a pilgrimage to mankind. He believed that the essence of all religions is the same and there is a spiritual unity in all religions. He was a great preacher of equality and amity in all religious beliefs. He gave importance on economic equality. He felt the importance of learning of all languages besides Hindi. He began to consider the possibility of a universal language for the people of India, being a multilingual nation. Gandhiji wanted to stitch the different cultures of a vast country like India in the light of assimilated idealisms of all nations and political philosophy. He thought non-violence, non-cooperation, spiritual strength and love are the ways to achieve Swaraj. Gandhiji was an apathetic Indian saint. He paved the way of not only the unity of Hindu - Muslims, but also the unity of whole mankind.*

**Keywords: Mahatma Gandhi, Diversity, Unity, India, Equality, Hind Swaraj, Non-Violence, Hindu -Muslim, Humanity.**

||এক||

“This is the man who has stirred three hundred million people to revolt, who has shaken the foundations of the British Empire, and who has introduced into human politics the strongest religious impetus of the last two thousand years” একথা লিখেছেন রোম্যান্স রোল্যান্ড (১৮৬৬-১৯৪৪) তাঁর ‘Mahatma Gandhi’ (১৮৬৯-১৯৪৮) গ্রন্থে। ইনিই সেই গান্ধি, যার প্রভাবে আন্দোলিত হয়েছিল সহস্র সহস্র ভারতবাসী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যিনি ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। প্রায় দু’হাজার বছরের বেশি সময় ধরে যে অহিংসার বোধ ‘আত্মার শক্তি’তে ভারতবাসীর হৃদয়ে সুগ্ৰথিত ছিল, তাকে নতুনভাবে সমাজ

পরিবর্তনের অঙ্গরূপে যিনি প্রয়োগ করেছিলেন - সেই তিনি গান্ধি। দুরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে অহিংসা এবং তা কখনো ধর্মবিরুদ্ধ নয়। এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যিনি, তিনি স্বয়ং গান্ধি। রোম্যাঁ রোল্যাঁ আরও লিখেছেন - “.....his first real lesson in ahimsa by teaching him to apply heroic passivity - if two such words may be linked - to public life by fighting evil, not by evil, but by love. A little later we will discuss this magic word of ahimsa, the sublime message of India to the world”.<sup>২</sup> ভারতবাসীকে এই ‘অহিংসা’ শব্দটি মন্ত্রশক্তির মত মহনীয় বার্তা দিয়েছিল।

রোম্যাঁ রোল্যাঁর গ্রন্থটির নাম ‘Mahatma Gandhi The man who become one with the Universal Being.’ শুধু ‘মহাত্মা গান্ধি’ নয়, গান্ধির একটি সম্পূর্ণ পরিচয় শিরোনামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন লেখক। যার অর্থ হল তিনি (গান্ধি) সেই মানুষ যিনি সার্বজনীন একাত্ম লাভ করেছেন মহৎ বিশ্বের বৃহৎ সত্তার সঙ্গে। সহস্র সহস্র বৎসরের শান্তিকামী ভারতবর্ষের অন্তরের ধ্যান তিনি। জৈন ধর্মের মহাবীর, বৌদ্ধ ধর্মের ভগবান বুদ্ধ, হিন্দুধর্মের চৈতন্য যে অহিংসার সত্য প্রতিষ্ঠা করে মানব সমাজকে প্রেমমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, গান্ধির পরিশীলিত সত্তা ভারতআত্মার সেই উত্তরণের উজ্জ্বল দীপমালা।

গান্ধি ভারতবর্ষকে জেনেছেন। ভারতআত্মা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। বাল্যকালে তাঁর নিজের অপরাধে পিতার অশ্রু বিসর্জনের কথা মনে পড়েছে তাঁর। সে অশ্রুকে তিনি মুক্তাবিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। পিতার অশ্রু তাকে শুদ্ধ করেছে, পবিত্র করেছে। গান্ধি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন - “This was, for me, an object - lesson in ahimsa.”<sup>৩</sup> তিনি ছোটকালে পড়েছেন রামায়ণ। ইউরোপ এবং আফ্রিকা তাঁর কাছে আন্তর্জাতিক পাঠশালা। তিনি বুদ্ধচরিত এবং বাইবেল পড়েছেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন। হিন্দুশাস্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণা জন্মেছে, সংযমের সাধনা হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের ব্রত। জননী পুতলীদেবীর ব্রতপালন এবং ঈশ্বর বিশ্বাস পুত্রের উপর বর্তেছিল। উপাসনা এবং প্রার্থনা তাঁর জীবনের প্রকৃত সত্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের স্তুতি তাঁর হৃদয়কে নির্মল করে তোলে। সে উপাসনায় ছিল নম্রতা। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন - “But it must be combined with the utmost humility”<sup>৪</sup>

অবশেষে তরুণ বয়সেই তিনি গীতার সারমর্ম উপলব্ধি করলেন। গীতাই তাঁকে শেখাল ত্যাগের মধ্যে নিহিত রয়েছে ধর্ম। ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’র দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, নিকাম কর্মযোগে ফলের নাশ নেই। এই ধর্ম অতি অল্পমাত্রায় অনুষ্ঠিত হলেও মহৎ সংসার ভয় হতে রক্ষা করে:

“নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।  
স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।”<sup>৫</sup>

গীতায় আরো বলা হয়েছে, ভোগের দিকে চিত্ত ধাবিত থাকলে সাংসারিক আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। ভোগকামনা শূন্য হলে ব্যক্তির হৃদয় ত্যাগের সাধনায় নিবদ্ধ হয়:

“কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম।  
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি”।<sup>৬</sup>

গীতাপাঠের মধ্যে গান্ধির হৃদয় ঝংকৃত হয়ে উঠল। ভগবদগীতা গান্ধির কাছে অমূল্য গ্রন্থরূপে চিহ্নিত হল। হিন্দুর এই ধর্মগ্রন্থ তাঁর কাছে দুঃখ ও হতাশার বিশল্যকরণী রূপে কাজ করল। তাঁর তরুণ মন গীতা, আরনল্ডের বুদ্ধচরিত ও যীশুর বাক্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে পেল। তিনি উপলব্ধি করলেন, ত্যাগেই ধর্ম। তিনি তাঁর ‘আত্মজীবনী’ গ্রন্থে লিখেছেন – “My young mind tried to unify the teaching of the Gita, the Light of Asia and the Sermon on the Mount. That renunciation was the highest form of religion appealed to me greatly”.<sup>১</sup>

দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা গান্ধিকে বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পৃথিবীর পাঠশালায় যথার্থ বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন তিনি। ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ার পরে এটি তাঁর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত বাঁক। অভিজ্ঞতার মাইল ফলক ছুঁতে পেরেছিলেন তিনি। গান্ধি পড়েছিলেন Tolstoy এর – “Kingdom of God is within you” এবং John Ruskin - এর ‘Unto this Last’ - এই দুটি গ্রন্থ। তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ‘কুলি ব্যারিস্টার’ (Coolie Barrister) নামে। নিম্নবর্গীয় মানুষদের প্রতি মমত্ব এবং তাদের জন্য সংগ্রামকেই তিনি জীবনের অন্যতম সংকর্ম বলে মনে করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ তাকে ব্যথিত করেছিল। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীরতর হয়েছিল। তিনি লিখেছেন যীশু হলেন একমাত্র ঈশ্বরের নিষ্পাপ সন্তান – “He (Jesus) is the only sinless Son of God”.<sup>২</sup> খ্রীষ্টের অপার করুণা তাঁর জীবনকে ধৌত করেছিল। এছাড়া পত্নী কস্তুরদেবীর কাছ থেকে তিনি সহিষ্ণুতার শিক্ষা লাভ করেছিলেন। জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ম্যাক্সমুলারের ‘ভারতবর্ষ কি শেখাতে পারে?’ (India – What can it Teach us?) এই গ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন। আর পড়েছিলেন ‘The Theosophical Society’ প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদ। উপনিষদের সেই প্রথম শ্লোক যেখানে লেখা রয়েছে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, কারো ধনে লোভ করো না। আসক্তি বিহীন ব্যক্তিই হলেন স্বাধীন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বলেছেন:

“ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম”।<sup>৩</sup>

গান্ধিজি ভারতবর্ষে ফেরার পর উপলব্ধি করেছেন এখানে রয়েছে বর্ণবিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, ক্লেদপূর্ণ অসম সমাজ ও অসম অর্থনীতি। যেখানে অসম রেনেসাঁর গনগনে তাপে পুড়ে যায় ব্রাত্যজীবন, যা বহু শতাব্দী জুড়ে বিরাজ করেছে। তবু এই চেনা ভারতবর্ষই গান্ধির কর্মভূমি হয়ে উঠল। আপনার কর্তব্য ঠিক করে নিলেন তিনি। তিনি তাঁর আত্মজীবনী ‘The story of my experiments with Truth An Autobiography’ - গ্রন্থে ‘The Bombay Meeting’ রচনায় লিখলেন, দেশপ্রেমিক তাঁর মাতৃভূমিকে সেবার কোন পথকেই উপেক্ষা করেন না – “A patriot cannot afford to ignore any branch of service to the motherland”.<sup>৪</sup> ভগবান কৃষ্ণের গীতার শ্লোকের স্পষ্ট নির্দেশকে তিনি নতমস্তকে শিরোধার্য করলেন। শ্লোকটির উল্লেখও তিনি করেছেন তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের ‘The Bombay Meeting’ - রচনায়। শ্লোকের সারমর্ম হল - পরধর্ম অপেক্ষা গুণহীন বা অঙ্গহীন স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও ভাল। কিন্তু পরধর্ম ভয়ঙ্কর। ‘শ্রীমদভগবদগীতা’র তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক উক্ত শ্লোকটি নিম্নরূপ:

“শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্যাং স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ”।<sup>৫</sup>

নিজেকে গীতার অভ্যাসযোগের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছেন গান্ধি। তাঁর নবচিহ্নিত কর্মপথে নানা অনুসন্ধানের ধরা পড়েছে ভারতবর্ষের পর্ণকুটির। সুবৃহৎ সংসারের পল্লির দরজায় দরজায় তিনি তাঁর পদচিহ্ন রেখে গেছেন। তাঁর কর্মের পথ বড় কন্ট্রাক্টর, জটিল। দুর্গম সেই পথ। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের ‘The Calm after the storm’ - রচনায় লিখেছেন, - আমার অধিকাংশ সময় জনসেবাতেই কেটে যাচ্ছিল - “Public work now began to absorb most of my time.”<sup>১২</sup> এরপর গান্ধি মোহমুক্তির প্রয়োজনে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করলেন। ব্রহ্মচর্য হল সর্ব ইন্দ্রিয়ের সংযম সাধনা। মোক্ষ সাধনার পথে তিনি অগ্রসর হলেন। একান্তই সরল জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যেই তিনি বুঝেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁর কর্মক্ষেত্র নয়। তাঁর কর্মক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। তিনি স্থায়ীভাবে স্বদেশে প্রত্যগমনকে সময়োচিত মনে করলেন। সত্যদৃষ্টির অধিকারী গান্ধির অবিচল বিশ্বাস, সত্যের অনুসন্ধানের মূলে আছে অহিংসা। অহিংসার ব্যবহার না হলে সত্য লাভ হয় না। আত্মজীবনী গ্রন্থের ‘A Tussle with Power’ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন - “This ahimsa is the basis of the search for truth. I am realizing every day that the search is vain unless it is founded on ahimsa as the basis”.<sup>১৩</sup>

এই পর্বেই গান্ধিজি কাজ করেছেন অস্পৃশ্য কুলি বস্তিতে, প্লেগে, মড়কে - মহামারিতে। তাঁর উপলব্ধি - ১) ব্যক্তির কল্যাণ সমষ্টির কল্যাণের মধ্যে নিবদ্ধ, ২) একজন উকিলের কাজের মূল্য ও একজন নাপিতের কাজের মূল্যের সমান। কারণ কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জনের অধিকার উভয়েরই সমান। ৩) সাধারণ মজুর, শ্রমিক এবং কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন। রাফিনের ‘Unto this Last’ গ্রন্থের সেই অনুবাদ গান্ধিজি করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন ‘সর্বোদয়’। উপরিউক্ত গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলি তিনি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এরকম সরলভাবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজির সমাজ সেবামূলক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল টলস্টয় ফার্মে আত্মনিয়োগ করা। ভারতীয় কিশোরদের শিক্ষাদান তার মধ্যে অন্যতম। আধ্যাত্মিক শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করা গান্ধিজির শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১৯১৫ সালের ৯ ই জানুয়ারি গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকাপাকিভাবে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। মহামতি গোখলের প্রস্তাবক্রমে গান্ধি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা নির্বাচিত হন ঐ একই বছরে। ভারতে গান্ধিযুগের সূচনা ১৯১৫ সাল থেকেই। ভারতবর্ষ থেকে শুরু হল তাঁর প্রকৃত কর্মযোগ। গান্ধির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল কোন ভারতবর্ষ? এই বিস্ময়ের ভারতবর্ষই হয়ে উঠেছিল গান্ধির ধ্যান জ্ঞান। কেমন এই ভারতবর্ষ? A.L. Basham তাঁর ‘The Wonder That was India’ গ্রন্থে এমন সাধের ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছেন - “India was a cheerful land, whose people, each finding a niche in a complex and slowly evolving social system, reached a higher level of kindness and gentleness in their mutual relationships than any other nation of antiquity. For this, as well as for her great achievements in religion, literature, art and mathematics, one European student at least would record his admiration of India’s ancient culture”.<sup>১৪</sup> এই ভারতবর্ষই গান্ধির ভারতবর্ষ। মহাপুরুষের কর্মক্ষেত্র।

||দুই||

“Gurudev himself is international because he is truly national”.<sup>১৫</sup> - অর্থাৎ বিশ্বভারতী নিশ্চয়ই এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, আবার সন্দেহাতীত ভাবে সে আন্তর্জাতিক। গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একথা লিখেছেন ‘Harijan’ - পত্রিকায় ১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ সালে। রবীন্দ্রনাথের একটি

চিঠির উত্তরে গান্ধিজি একথা লিখেছিলেন। তিনি যখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন কবিগুরু যে চিঠিখানি মহাত্মাজিকে দিয়েছিলেন, সেখানে লেখা ছিল - “You know that though this institution is national in its immediate aspect it is international in its spirit, offering according to the best of its means India’s hospitality of culture to the rest of the world”.<sup>১৬</sup> - অর্থাৎ শান্তিনিকেতন বস্তুত জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এর প্রাণপ্রেরণা আন্তর্জাতিক। সমস্ত পৃথিবীকে এই প্রতিষ্ঠান সামর্থ্য অনুসারী অভ্যর্থনা ও আতিথ্য দিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজিকে চিঠিতে একথাই লিখেছেন।

একথা ঠিক, জাতীয়তা একটা ভাব, যা স্বদেশপ্ৰীতি ও স্বজাতিপ্ৰীতি। কিন্তু তা মানবতা সমৃদ্ধ উত্তরণ না হয়ে যখন তা সংকীর্ণ হয়ে ওঠে, উর্দ্ধগমন না হয়ে তা বিশ্বজনীন বর্জিত হয়ে ওঠে তখন সে অন্ধ। পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ, কূপমন্ডুকতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় ভরপুর হয়ে ওঠে। এমন জাতীয়তা বহির্বিশ্ব তথা মানব সমাজের প্রতি কল্যাণদীপ জ্বালিয়ে দেয় না। তা কখনো হয়ে ওঠে উগ্র, কখনো মানব সংহারক। কিন্তু সুস্থ জাতীয়তার সরল সিঁড়ি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতার নির্মল উঠোনে পা রাখা সম্ভব। এমন জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমৈত্রী, মানব কল্যাণ ও মানব সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে। সমস্ত মানবজাতির মানবতাবোধের মিলিত সাংস্কৃতিক সুর অনুরণিত হয় আন্তর্জাতিকতার সামসঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক। গান্ধি আন্তর্জাতিক। পরস্পর পরস্পরকে বুঝেছিলেন পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়। জাতীয়তার সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ আচ্ছাদন দূরে সরিয়ে দু’জনেই হয়ে উঠেছিলেন সার্বজনীন, সর্বকালিক ও সর্বমানবিক। এবং বিশ্বমৈত্রীর উপাসক। বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে পরস্পর পরস্পরের প্রতি লেখা দু’টো চিঠিই সে প্রমাণ রেখে গেছে।

ভারতবর্ষ সেই দেশ, যেখানে বিশ্বমৈত্রীর বাণী উৎসারিত হয়েছে। সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে এখানে বেজেছে আন্তর্জাতিকতার মহতী সুর। গান্ধিজি ‘Young India’ পত্রিকায় জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে সুন্দর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন - “In my opinion, it is impossible for one to be an internationalist without being a nationalist..... It is not nationalism that is evil, it is the narrowness, selfishness, exclusiveness which is the bane of modern nations which is evil. Indian nationalism has, I hope, struck a different path. It wants to organize itself or to find full self – expression for the benefit and service of humanity at large”.<sup>১৭</sup> আন্তর্জাতিকতা ভারতীয় সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সহিষ্ণু এই মাতৃভূমি অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের আশ্রয়ভূমি হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানবজাতির তীর্থভূমি। প্রজার কল্যাণ যদি রাজার পবিত্র কর্তব্য হয়, তাহলে বলতেই হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট হলেন অশোক। তিনি বিশ্বমৈত্রীর সুমহান প্রচারক। তিনি বলেছিলেন - পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমার ভাই। পৌত্তম বুদ্ধের দেশ এই ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের ‘ভারততীর্থ’ (১০৬ সংখ্যক) কবিতায় লিখেছেন:

“হেথায় আর্য, হেথা অনার্য  
হেথায় দ্রাবিড়, চীন -  
শক-ছন-দল পাঠান মোগল  
এক দেহে হল লীন  
যারা এসেছিল সবে,

তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে  
কেহ নহে নহে দূর,  
আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে  
তারি বিচিত্র সুর।

.....  
এসো হে আর্য, এসো অনার্য,  
হিন্দু মুসলমান।  
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ  
এসো এসো খৃষ্টান।  
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন  
ধরো হাত সবাকার,  
এসো হে পতিত করো অপনীত  
সব অপমানভার।

.....  
সবার - পরশে - পবিত্র-করা  
তীর্থনীরে  
আজি ভারতের মহামানবের  
সাগরতীরে।”<sup>১৮</sup>

মানবপ্রেমিক গান্ধি পৃথিবীবাসীকে মানবতার দীপ জ্বলে পূর্ণ, শুদ্ধ ও পবিত্র করতে চেয়েছেন। তাঁর কর্মস্থান ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে থেকে তিনি পৃথিবীবাসীকে অহিংসার মন্ত্র শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও হয়ে উঠেছেন আন্তর্জাতিক - মানবতার পবিত্র প্রতীক। আন্তর্জাতিকতা প্রকৃত জাতীয়তার যথার্থ সঙ্গত পরিণতি। গান্ধিজি লিখেছেন - “Internationalism is possible only when nationalism becomes a fact, i.e., when people belonging to different countries have organized themselves and are able to act as one man.”<sup>১৯</sup>

বহু বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু তার মধ্যে থেকেও বেজে উঠেছে ঐক্যের সুর। ভারতীয় জাতিসত্তা একটি বিশেষ জাতিকে নিয়ে গড়ে ওঠে নি। বহু জাতির মিলনে সমুদ্র সংগম ঘটেছে ভারতীয় জাতিসত্তায়। সারাজীবনের অধীত সাধনায় গান্ধিজি হয়ে উঠেছেন বিশ্বনাগরিক। বিশ্বপথিক তিনি। ভারতবর্ষ থেকে সৌভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা তিনি পৃথিবীবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই সৌভ্রাতৃত্ববোধ উপলব্ধির বিষয়। সৌভ্রাতৃত্ববোধ ভারতীয়দের আইডেনটিটি। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতার সৌভ্রাতৃত্বের বাণী চন্দ্রালোকিত নির্মল জ্যোৎস্নায় পৃথিবীবাসীকে পরিপ্লাত করেছিল। সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে ভগবান বুদ্ধের শাস্তিমন্ত্র প্রচারের জন্য সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। গান্ধিজি ভারতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের তেমনই এক প্রাণপুরুষ। ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তর-সাধক। প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে জীবনবোধ আহরণ করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অহিংস বিশ্বমৈত্রীর প্রচারক। প্রাচীনকালে ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, এককথায় প্রায় সমগ্র এশিয়া মহাদেশে, এমন কি সমুদ্র পরিবেষ্টিত দ্বীপসমূহে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং জীবনচর্যার প্রসার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং বহির্বিশ্বে রামকাহিনীর বিস্তারের মধ্য

দিয়ে আমরা তার পরিচয় পেয়ে যাই। প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্ক ছিল অতীব গৌরববোধক। ভারতীয়রা কখনোই লুণ্ঠনকারী ছিলেন না। সাম্রাজ্য দখল, পরজাতি নিপীড়ন করে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বৃদ্ধি ঘটেনি। সম্রাট অশোক চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক হয়েছেন। ধর্মবিজয়কেই তিনি সময়োচিত মনে করেছেন। আত্মিক উজ্জীবন ছিল ভারতীয়দের প্রাণশক্তি। ভারতীয় ঋষিদের আত্মসাধনার পরিচয় পেয়েছে ইউরোপ। আধুনিক ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা, সৌভ্রাতৃত্ব ও অহিংসা বাণীর নবতম প্রচারক হয়ে উঠেছেন গান্ধিজি। ‘Young India’ পত্রিকায় প্রকাশিত (০৯.০৩.১৯২৯) ‘Brotherhood of Man’ বিষয়ক একটি আলোচনায় তিনি বলেছেন – “The conception of my patriotism in nothing if it is not always in every case, without exception, consistent with the broadest good of humanity at large.”<sup>২০</sup>

ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর দেশ নয়, শুধু মুসলমানের দেশ নয়, নয় শুধু খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ বা পারসিকের দেশ। ভারতবর্ষ শুধু আর্ষের দেশ নয়, নয় শুধু অনার্ষের দেশ। এককথায় ভারতবর্ষ সমস্ত জাতি ও ধর্মের মানুষের দেশ। কোন একক জাতি নিয়ে ভারতীয় জাতি সত্তা গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের ধর্ম রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের গোরার ধর্মবোধের মত। গোরা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান নয়, গোরা ভারতীয়। একথা ঠিকই, গান্ধিজি হিন্দু পরিবারেই জন্মেছিলেন। কিন্তু সকল ভারতবাসীর মিলিত ধর্মই গান্ধির ধর্ম। ভারতবর্ষে বসবাসকারী সমস্ত ধর্মমতের মানুষই অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে এসেছে এদেশে বিভিন্ন ধর্ম বিরাজ করা সত্ত্বেও তারা ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসী। আমাদের জাতীয় সত্তা সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বকে মান্যতা দেয়। পৃথিবীতে সার্বজনীন ধর্ম-দর্শন বলে যদি কিছু থাকে, তবে তা এই ভারতভূমি থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন ঐক্যবোধই ভারতীয় সংস্কৃতির মৌল চরিত্র। গান্ধিজি কখনোই বিদেশের প্রতি উল্লাসিক অবজ্ঞা রেখে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান নি। সব দেশের মানুষের মধ্যে রয়েছে মানবতা এবং মূল্যবোধ। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যেই মানব প্রবাহ এমন সার্বজনীনত্ব অর্জন করেছে। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য তপস্যা করেছে। কিন্তু সে তপস্যা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। কবে যে সে তপস্যা সম্পূর্ণ হবে আমরা জানি না। প্রেম-ভালবাসা-মৈত্রী - মনুষ্যত্ব - মানবতা যে জাতি যত বেশি সংশ্লেষ করেন, মানব সমাজে ও জগৎ সভায় সেই জাতিই বেশি সম্মানিত হন। বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-মহম্মদ-চৈতন্য - সমস্ত মহাপুরুষই এক এক জাতি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সার্বজনীন মানবতা ও মানব মৈত্রীর কথাই বলেছেন। সংকীর্ণতা অভিমুখী নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার অন্ধ ও উগ্র জাতীয়তার জন্ম দেয়। এর থেকেই জন্ম নেয় হিংসা, পরজাতি বিদ্বেষ, যুদ্ধ ও দাঙ্গা। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া যুদ্ধ ও দাঙ্গার রূপ সর্বত্রই এক। ১৯৪০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গান্ধি বলেছেন – “I cannot claim any superiority for Indians. We have the same virtues and the same vices. Humanity is not divided into watertight compartments so that we cannot go from one to another. .... I would not say, ‘India should be all in all, let the whole world perish.’ That is not my message. India should be all in all, consistently with the well being of other nations of the world.”<sup>২১</sup>

নানা জাতি ও ধর্মের এই দেশ। প্রাচীনযুগে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ছিল সর্বব্যাপক। বর্তমান ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান। মধ্যযুগের সময়কালীন ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের অধীনে থাকলেও হিন্দু সংস্কৃতি এবং ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও কিছু পার্থক্য থেকে গেছে।

বর্তমানে সংখ্যার বিচারে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরেই ভারতবর্ষেই বেশি ইসলাম ধর্মের মানুষ বাস করেন। এছাড়া রয়েছেন বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক, খ্রীষ্টান এবং জৈন ধর্মের মানুষ। গান্ধিজি ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ দূর করার জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই একমাত্র সময়োচিত কাজ বলে মনে করেছেন। মৈত্রী এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকেই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন। অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন গান্ধি। অন্য ধর্মের রীতিনীতি, পোশাক-আশাক, ধর্ম-দর্শন, আচার-আচরণ, খাদ্য তালিকা এককথায় সামগ্রিক জীবনচর্যার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণকে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কর্ম বলে মনে করেছেন তিনি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথাও গান্ধি বলেছেন। সর্বোপরি ঈশ্বর এক - এই ধারণায় বিশ্বাসী তিনি। ১৯২৪ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর 'Young India' পত্রিকায় ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে মহাত্মাজি লিখেছেন - "The need of the moment is not one religion, but mutual respect and tolerance of the devotees of the different religions. We want to reach not the dead level, but unity in diversity. Any attempt to root out traditions, effects of heredity, climate and other surroundings is not only bound to fail, but is a sacrilege. The soul of religions is one, but it is encased in a multitude of forms."<sup>২২</sup> বন্ধু এবং শত্রু সকলকেই ভালবাসতে চেয়েছেন মহাত্মাজি। সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন শান্তির বার্তা। হিন্দু-মুসলমান সকলকে ভালবাসা এবং সেবার মধ্যে দিয়ে তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। ৩ এপ্রিল, ১৯২৪ সালে 'Young India' -পত্রিকায় 'My Mission' নামের রচনায় মহাত্মাজি লিখেছেন - "I want to live at peace with both friend and foe. Though, therefore, a Musalman or a Christian or a Hindu may despise me and hate me, I want to love him and serve him even as I would love my wife or son though they hate me."<sup>২৩</sup>

ধর্মগত বৈচিত্র্যের মধ্যেও গভীর অন্তর্নিহিত সঙ্গতি ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিভিন্ন জাতি-ধর্মের জীবনচর্যার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও হিন্দুর প্রার্থনায় কিংবা মুসলমানের প্রার্থনায় অথবা খ্রীষ্টানের প্রার্থনায় কোন তফাৎ নেই। সব প্রার্থনার উদ্দেশ্যই কল্যাণ কামনা। ব্যক্তি, পরিবার-পরিজন এবং সমাজের মঙ্গল কামনাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। ধর্ম-জাতি-বর্ণের উর্ধ্ব সকলের প্রার্থনার অভিমুখ হয়ে ওঠে মানব কল্যাণ। গান্ধিজি 'Young India' পত্রিকায় প্রকাশিত (December 22, 1927) মিশনারীদের উদ্দেশ্যে একটি মিটিং-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন - "I do not expect India of my dream to develop one religion, i.e., to be wholly Hindu, or Wholly Christian, or wholly Musalman, but I want it to be wholly tolerant, with its religions working side by side with one another."<sup>২৪</sup>

ধর্মবোধের সাম্য গান্ধির জীবনচর্যার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। গান্ধিজি ধার্মিক মানুষ ছিলেন। এ বিষয়ে সমস্ত সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্ব তিনি উঠেছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি হিন্দু। কিন্তু অন্ধ ধর্মবোধ তাঁর মধ্যে ছিল না। হিন্দুধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যও তিনি দেখান নি। আসলে গান্ধি সমস্ত ধর্মের মধ্যে সমতা (Equality of Religions) প্রতিষ্ঠার মহতী কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসী গান্ধিজি হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ এবং খ্রীষ্টানের গীর্জার মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাননি। প্রকৃতপক্ষে মানবতার অসীম দুর্নিরীক্ষ্য সমুদ্রে তিনি ডুব দিয়েছিলেন। যে কোন ধর্মস্থানই ঈশ্বরের বাসস্থান - একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। সমস্ত ধর্মই সমান। সব ধর্মের মধ্যেই আছে আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত গভীর অন্বয়। গান্ধিজি ১৯৩০ সালে একটি চিঠিতে লিখেছেন - "Looking at all religions with an equal eye, we would not only not hesitate, but would think it our duty to blend into our faith every acceptable feature of other



faiths.”<sup>২৪(ক)</sup> প্রতিটি ধর্মের গভীরেই থাকে এমন বিশ্বাস। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানুষ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আপন আপন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। যুক্তি বুদ্ধির থেকেও তা পৃথক। ধর্মের শক্তি থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি। বিশ্বাস বহন করে অভিজ্ঞতাকে। বিশ্বাস আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির বার্তাবহ হয়ে ওঠে। গান্ধি লিখেছেন – “True knowledge of religion breaks down the barriers between faith and faith. Cultivation of tolerance for other faiths will impart to us a truer understanding of our own.

Tolerance obviously does not disturb the distinction between right and wrong, or good and evil. The reference here throughout is naturally to the principal faiths of the world. They are all based on common fundamentals. They have all produced great saints..... The acceptance of the doctrine of the Equality of Religions does not abolish the distinction between religion and irreligion.”<sup>২৫</sup>

গান্ধিজি ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করতে চান নি। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা। কোন ধর্ম অথবা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দ্বারা নয়। বৈচিত্র্যের দেশ এই ভারতবর্ষ। নানা ধর্মের মানুষের বাসস্থান এই দেশ। নানা বিশ্বাসের দেশ এই ভারতভূমি। সুতরাং এই দেশের এক ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রের সন্ধান করেছেন তিনি। ধর্ম নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়েই সমগ্র দেশের সভা ও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চরিত্রের মূল অন্বেষণ করেছেন তিনি। আর এমন জাতীয়তাই আন্তর্জাতিকতার পথকে প্রশস্ত করে। ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গোরার ভারতবর্ষ। কোন ধর্ম বা ধর্মমতের প্রতিনিধিরা কখনো রাষ্ট্র পরিচালনা করেন না। রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের কোন স্থান থাকা উচিত নয়। অপরপক্ষে ধর্মের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রেরও মাথা ঘামানো কখনোই উচিত কাজ হবে না। এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধিজি ঘোষণা করলেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় – ‘Religion a Personal Matter.’ ৯ আগস্ট, ১৯৪২ সালে ‘হরিজন’ পত্রিকায় গান্ধিজি লিখেছেন – “Free India will be no Hindu raj, it will be Indian raj based not on the majority of any religious sect or Community but on the representatives of the whole people without distinction of religion. .... Religion is a personal matter which should have no place in Politics.”<sup>২৬</sup>

আর আপন ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও গান্ধি হয়ে উঠেছিলেন ধর্ম সংস্কারক। হিন্দুধর্মের নানা কুপ্রথা এবং কুসংস্কারের তিনি বিরোধিতা করেছেন। এমন কি সেগুলি দূর করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি আন্দোলনে নেমেছেন। হিন্দু মন্দিরে পশুবলি, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন, ঠিক তেমনি বিধবা বিবাহের সমর্থনে আন্দোলনে নেমেছেন। হিন্দু সমাজে নিম্নবর্গীয় মানুষকে ‘অস্পৃশ্য’ ‘অচ্ছুৎ’ বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রাচীনকাল থেকে শূদ্র সম্প্রদায়কে পরিশীলিত সমাজ থেকে দূরে রেখেছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভারতীয় সমাজের এক অভিশাপ। অস্পৃশ্যরা হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পায়নি। শুধু তাই নয়, সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত স্থানেও তাদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হতো। এক অস্পৃশ্যতা মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ১৯২১ সালের ২৭শে এপ্রিল ‘Young India’ – পত্রিকায় প্রকাশিত আমেদাবাদে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সভার শুরুতে প্রথম বাক্যটিতেই বলেছেন – “I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism.”<sup>২৭</sup>

||তিনি||

গান্ধিজির অর্থনৈতিক সাম্যের ভাবনা (Economic Equality) গ্রাম স্বরাজ, গ্রাম পুনর্গঠন ও গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিহিত। গান্ধির মতে, ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রাম হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি গ্রামে এক এক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। তারা হবেন স্বাবলম্বী। সুবৃহৎ এই ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে গ্রাম-শহর, পোশাক-আশাক, খাদ্যতালিকা এবং জীবনচর্যার বিশেষ পার্থক্য জনিত কারণে অর্থনৈতিক বিষমতা ছিল। তবে গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানদের অবস্থা প্রায় একরকম। শহরে বসবাসকারী উচ্চবিত্ত হিন্দুদের জীবন যাপনের খরচ - খরচা মুসলমানদের থেকে বেশি। গান্ধির গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে ভূমিসংস্কার, দরিদ্র কৃষকদের জমির অধিকার, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, খাদি ও কুটির শিল্পের প্রসার, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং শোষণহীন সাম্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাই ব্যক্ত করেছেন তিনি। গান্ধির কাছে এগুলি ছিল অর্থনৈতিক আত্মশক্তির বিকাশ। ব্যাপকভাবে যন্ত্রসভ্যতা, কলকারখানা ও শহর সভ্যতার অসম ধনস্বর্গীতিকে তিনি মান্যতা দিতে পারেন নি। তার থেকে দেশীয় চরকাকেই সময়োচিত মনে করেছেন তিনি। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের এক সভায় ‘Economic Independence’ - প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গান্ধিজি বলেছেন - “Then take economic independence. It is not the product of industrialization of the modern or the Western type. Indian economic independence means to me the economic uplift of every individual, male and female, by his or her own conscious effort. Under the system, all man and women will have enough clothing - not the mere loin-cloth, but what we understand by the term necessary articles of clothing - and enough food, including milk and butter which are today denied to millions.”<sup>২৮</sup>

গান্ধিজি মনে করেন, অহিংসার মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলধন (Capital) এবং শ্রমের (Labour) মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে গেছে। এই দ্বন্দ্বের অবসানের মধ্যেই অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিফলন সম্ভব। গান্ধিজি লিখেছেন - Working for economic equality means abolishing the eternal conflict between capital and labour. It means the levelling down of the few rich in whose hands is concentrated the bulk of the nation’s wealth on the one hand, and the levelling up of the semi-starved naked millions on the other.”<sup>২৯</sup> অপরপক্ষে হিংসার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে রক্তপাত (bloody revolution) অনিবার্য হয়ে ওঠে। গান্ধিজি তা কখনোই কাম্য মনে করেন নি।

বহু ভাষাভাষীর দেশ - আমাদের এই ভারতবর্ষ। ভাষাগত বৈচিত্র্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। ভারতবর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনে ভাষা ব্যবহার বিষয়ে গান্ধিজি বিভিন্ন সময়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তার স্ফূর্তি তাঁর ছিল। তিনি তাঁর ‘The Story of my experiments with truth an autobiography’ গ্রন্থের ‘At The High School’ - রচনায় লিখেছেন, ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষা ছাড়াও রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী ও ইংরেজিকে স্থান দেওয়া আবশ্যিক। তিনি মনে করেন, উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কোন ভাষাকেই অনাবশ্যিক বোঝা বলে মনে হবে না। ভাষাশিক্ষার ফলে তাকে আর চাপানো বলে মনে হবে না। তা হয়ে উঠবে রসবোধের বাহক। অন্যভাষায় জ্ঞানলাভও সহজ হবে। তখন হিন্দি, গুজরাটি ও সংস্কৃত একই ভাষা বলে গণ্য হবে। সর্বোপরি তিনি সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যিকতার কথাও বলেছেন - “It is now my opinion that in all Indian curriculum of higher education there should be a place for Hindi, Sanskrit,

Persian, Arabic and English, besides of course the vernacular.”<sup>৩০</sup> বাল্যকালে ইংরেজি শেখার ফলে সন্তান জীবনযাত্রার দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে যায়, এ কথাকে তিনি মান্যতা দিতে পারেন নি। গান্ধিজি মনে করেন, বাল্যকাল থেকে সন্তান ইংরেজি ভাষায় কথা বলার ফলে দেশজ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শিশুকালে সন্তানের ইংরেজিতে কথা বলার শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে তিনি পিতামাতার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন – “It has always been my conviction that Indian parents who train their children to think and talk in English from their infancy betray their children and their country. They deprive them of the spiritual and social heritage of the nation, and render them to that extent unfit for the service of the country.”<sup>৩১</sup> ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ, সুতরাং ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য মহাত্মাজি একটি সার্বজনীন ভাষা – সম্ভাবনার উৎসমুখ উন্মোচন করেছেন। ইংরেজি তখনও কতিপয় শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সুবিশাল দেশে সব মানুষ বোঝেন বা কথা বলেন এমন কোন ভারতীয় ভাষা ছিল না। ভারতের বেশির ভাগ মানুষের মাতৃভাষা হল হিন্দি। সুতরাং তিনি হিন্দি ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। তিনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে মার্চ ইন্দোরে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেছেন “Language is like our mother ..... Let us do the same and thus raise Hindi to the high status of a national language.”<sup>৩২</sup> এর কিছুকাল পরে ১৯৩৫ সালে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে গান্ধিজি হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি লিখেছেন – “If we want to make India one nation , whether one believes it or not, Hindi alone can be the national language for the simple reason that no other language can hope to have the advantages enjoyed by Hindi.”<sup>৩৩</sup> গান্ধিজি হিন্দির পাশাপাশি ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃত শেখার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের সময় সংস্কৃতের প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মনে করেন। ১৯৩৬ সালে ‘Navajiban’ পত্রিকায় তিনি লিখেছেন – “It is also my view that the education of every Hindu is incomplete without an elementary knowledge of Sanskrit.”<sup>৩৪</sup> সর্বোপরি গান্ধিজি বলেছেন, ভারতের নিরক্ষর জনগণের মুখের ভাষা ‘হিন্দুস্থানী’ (Hindustani)-ই হবে সুবৃহৎ ভারতীয় জনসমষ্টির মুখের ভাষা। হিন্দি ভাষার সঙ্গে উর্দুভাষার মিশ্রণজাত ভাষাই হল হিন্দুস্থানী ভাষা। তিনি লিখেছেন, কোটি কোটি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মুখের ভাষা হবে ‘হিন্দুস্থানী’ – “With some slight variations Hindi – Hindustani is the language spoken by about twenty – two crores of people, both Hindus and Muslims.”<sup>৩৫</sup>

১৯৩৮ সালে ‘Harijan’ পত্রিকায় তিনি আরও লিখলেন, ‘হিন্দুস্থানী’ ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের কথা বলার সাধারণ মাধ্যম। সে ভাষায় সাধারণ মানুষের উৎকৃষ্ট জাতীয়তাবাদ ‘All – India Nationalism’ অন্তরে জাগ্রত থাকে – “There is nothing wrong in making a knowledge of Hindustani compulsory, if we are sincere in our declarations that Hindustani is or is to be the Rashtrabhasha or the common medium of expression.”<sup>৩৬</sup>

অহিংসা গান্ধিজির জীবনাদর্শের মূলমন্ত্র। অত্যাচারিত একটি জাতিকে এই সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা তিনি শৃঙ্খলমুক্ত করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য তিনি সত্যের আলো রেখে গেছেন। অহিংসার সত্যকে তিনি বাস্তব সমাজ ও সংসারে প্রোথিত করে গেছেন। অহিংসার পথ অতীব দুরারোহ, কণ্টকাকীর্ণ। আত্মশুদ্ধি

ছাড়া সে পথে যাত্রা করা যায় না। গান্ধিজি বলেছেন, সত্য স্বরূপকে প্রাপ্তির পথে অহিংসা একটি অবলম্বন। আত্মশুদ্ধি ছাড়া বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয় না।

গান্ধিজি সুবৃহৎ ভারতীয় জাতিকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। এই দেশ যেমন হিন্দুর, ঠিক তেমনি মুসলমানের। বহু জাতির বাসভূমি এই দেশ। কিন্তু সমস্ত জাতির মিলিত আদর্শবোধকে একটি সুতোয় গেঁথে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি। বহুতর বৈচিত্র্যের দেশে প্রকৃত স্বরাজ হল তেমনিই একটি রাজনৈতিক দর্শন, যা দ্বারা ভারতবর্ষের একত্বকে তিনি শত শতদলের সুগন্ধিতে ভরপুর করে দিয়েছিলেন। এই স্বরাজ [Indian Home Rule (Hind Swaraj)] হল আত্মনিয়ন্ত্রণ। গান্ধিজি তাঁর [Indian Home Rule (Hind Swaraj)] গ্রন্থে বলেছেন - “Real home rule is self-rule or self-control”<sup>৭৭</sup> আর কোন পথে স্বরাজলাভ সম্ভব? গান্ধিজি সে উপায়ও নির্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন - অহিংসা, অসহযোগ, আত্মিক বল এবং ভালবাসার শক্তি। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন - “The way to it is passive resistance; that is soul-force or love-force”.<sup>৭৮</sup> সর্বোপরি এই বল বা শক্তি প্রয়োগের জন্য পুরোপুরি স্বদেশী বা আত্মনির্ভর হতে হবে - “In order to exert this force, Swadeshi in every sense is necessary”.<sup>৭৯</sup> গান্ধিজি বলেছেন, ত্যাগ এবং দুঃখ বরণের মহনীয়তাই কোন জাতিকে বড় করে তোলে। কোন জাতি দুঃখ বরণ না করে বড় হয় নি, স্বরাজও অর্জন করেনি - “Like others, will know that no nation has risen, without suffering”<sup>৮০</sup> আত্মশুদ্ধি ছাড়া অহিংসার লক্ষ্যে পৌঁছানো এক প্রকার অসম্ভব:

“Identification with everything that lives is impossible without self-purification, without self-purification the observance of the law of ahimsa must remain an empty dream”.<sup>৮১</sup> আত্মশুদ্ধির পথ অত্যন্ত বিপদ সংকুল। মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য কঠিন সাধনা করতে হয়। নিজেকে রিক্ত-নিঃস্ব করে তুলতে হয়। নম্রতার সে আরেক ভাষা। সকলের পেছনে দীন অবস্থায় হেঁটে যেতে হয় সেই কঠিন পথে পথে। গান্ধিজি লিখেছেন, নম্রতার শেষ সীমা হল অহিংসা - “Ahimsa is the farthest limit of humility”.<sup>৮২</sup>

### ||পাঁচ||

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ভারতবর্ষ ঐদিন স্বাধীন হয়েছিল। গান্ধিজি সেদিন ছিলেন কলকাতায়। সারাদিন বেলেঘাটা অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির অব্যবহৃত এক বাড়িতে সময় কাটিয়েছেন। উপবাস এবং প্রার্থনায় কেটেছে তাঁর। ভারতবর্ষ সেদিন স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোকে ধৌত হচ্ছে সবে মাত্র। প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার আনন্দে পরিম্লত ভারতমাতা। কিন্তু গান্ধিজির দুঃখ এবং যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি ছিল সেদিন। বিষণ্ণতা এবং একাকিত্বের সেই সে দিন। সেদিন দেশ ভাগ হয়েছিল। খণ্ডিত ভারতবর্ষ হাতে পেয়েছিল ভারতবাসী। জাতিতত্ত্বের বিন্যাস অনুসারেই ভারতভাগ। শুরু হল হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের হানাহানি। দেশভাগ রুখে দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু পারেন নি। তিনি বলেছেন, হিংসা সকলকেই আঘাত করে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব তিনি বুঝেছিলেন। দেশভাগের ফলে কারও কোন লাভ হয় নি। বিরোধের উপশমও হয় নি। ভারতবর্ষের মানুষ স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ - কি হিন্দু কি মুসলমান। ধর্মনির্ভর এই দেশের দুটি সুবৃহৎ জাতির অন্তর্নিহিত সত্যবোধের স্বরূপ গান্ধিজি বুঝেছিলেন।

ইসলাম ধর্মে শান্তির বার্তাই ঘোষিত হয়েছে। বিরোধকে প্রশয় দেওয়া হয় নি। ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের কথাই রয়েছে।

গান্ধিজি হজরত মহম্মদের জীবনী ও বাণী পড়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত গান্ধিজিও মহম্মদকে ‘Prophet’ বা ধর্মগুরু বা অবতার বলে মনে করতেন। জাতি - ধর্ম - নির্বিশেষে হিংসা, বিদ্বেষ বা বিরোধ নয়, পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী এবং প্রেমই জীবনপথ অতিক্রম করতে সাহায্য করে। ধর্ম বিদ্বেষ গান্ধিজির ছিল না। মুসলমানদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ভারতীয় সভ্যতা তো সমন্বয়ের কথাই বলে এসেছে চিরকাল। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে। হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরের ভাই। একই মায়ের দুই সন্তান। ভারতভূমি তো হিন্দু-মুসলমানের মিলিত তীর্থক্ষেত্র - পুণ্যভূমি। সৌভ্রাতৃত্ববোধের এমন নানা নিদর্শন ভারতভূমির গরিমাকে বৃদ্ধি করেছে নিশ্চয়ই। দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে অশীতিপর বার্ষিক্যপীড়িত গান্ধি (২ জানুয়ারি ১৯৪৭ - ১ মার্চ ১৯৪৭) মানুষের দরজায় দরজায় শান্তির খোঁজে হেঁটেছেন। আজ ২১শে নভেম্বর ২০২৩ সাল। প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েল যুদ্ধে নিরীহ নারী ও শিশুদের উপর যে পৈশাচিক মৃত্যু পরোয়ানা ইজরায়েলের রাষ্ট্রনেতাদের দ্বারা নেমে এসেছে ঈশ্বর বুঝি তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আজ যদি গান্ধি বেঁচে থাকতেন! মানুষের কল্যাণে তিনি কি করতেন আমরা জানি না। এই গান্ধিজি মুসলমান ভাইদের খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনী - ‘The story of my experiments with Truth An Autobiography’ - রচনায় তিনি বলেছেন, মুসলমান ভাইয়েরা এক মহৎ সংকল্প গ্রহণ করেছেন, যদি সরকার শান্তির শর্তের বিরোধিতা করেন, তবে মুসলমানেরা সরকারকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন - “If the peace terms are unfavourable to them - which may God forbid - they will stop all co-operation with Government.”<sup>8০</sup> তিনি আরো বলেছেন, খিলাফতের মতো ধর্মসঙ্গত পরিণতির যদি কোন ক্ষতি হয়, এবং খিলাফতের বিষয়ে যদি কোন বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করাই আমাদের কর্তব্য - “If Government should betray us in a great cause like the Khilafat, we could not do otherwise than non-co-operate. We are therefore entitled to non-co-operate with Government in case of a betrayal.”<sup>8১</sup>

যাই হোক, গান্ধিজি চিরকালই হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য একটি শক্তি। বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতা হল পতন - “That unity is strength is not merely a copybook maxim but a rule of life is in no case so clearly illustrated as in the problem of Hindu - Muslim Unity. Divided we must fall.”<sup>8২</sup> গান্ধিজি ২৮শে জুলাই ১৯২১ সালে “Young India”- পত্রিকায় লিখেছেন, আমাদের ঐক্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। হিন্দু এবং মুসলমানের ঐক্য ছাড়া জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয় - “Everybody knows that without unity between Hindus and Musulmans, no certain progress can be made by the nation.”<sup>8৩</sup> গান্ধির কথায় বার্তায়, জীবনচর্যায় বারবার ধরা পড়েছে মুসলমান প্রীতির কথা। তিনি হিন্দুদের মত মুসলমান ভাইদেরও সমানভাবে ভালবাসেন। তাঁর ধর্ম তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে সমস্ত জাতি সম্প্রদায়কে সমানভাবে ভালবাসার। ১৯২৪ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর “Young India” পত্রিকায় তিনি লিখেছেন - “I can do so, I must prove to the Musalmans that I love them as well as I love the Hindus. My religion teaches me to love all equally.”<sup>8৪</sup> গান্ধিজি মনে প্রাণে সমস্ত জীবন জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের অনুসন্ধান

করেছেন। তাঁর মতে, হিন্দুত্ব অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে, যদি এমন ঐক্য অর্জন করা সম্ভব না হয়। এবং ইসলামের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

“Today I beseech you to promise that you will, if necessary, lay down your life for the sake of Hindu-Muslim unity. For me, Hinduism would be meaningless if that unity is not achieved, and I make bold to say the same thing about Islam.”<sup>87</sup>

পারলেন কই? দেশভাগের সম্ভাবনা তাঁকে ব্যথিত ও বিহ্বল করে তুলেছিল। দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই কোন মঙ্গলজনক পন্থা খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। কেবল ঐক্যের কারণে। দেশভাগ যখন চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে, তখনও তিনি মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসে তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বোঝাতে পারলেন না কংগ্রেস নেতাদের। তাঁর প্রস্তাব বাস্তবের সঙ্গে মেলে না – এই যুক্তিতে জওহরলাল, প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তা বাতিল করলেন। গঠিত হল পাকিস্তান রাষ্ট্র। গান্ধিজি একা হয়ে গেলেন। বড়ই একা তিনি। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অধরা থেকে গেল। গান্ধি কেমন যেন নির্বাক হয়ে গেলেন। এক বৌদ্ধিক নিস্তব্ধতা তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে নেমে এল। তিনি হয়ে উঠলেন আধুনিক ভারতের নিম্পৃহ ঋষি। গান্ধি মানব মুক্তির এক পথ রচনা করেছেন। সে পথ কেবল হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের পথ নয়, সে পথ পৃথিবীব্যাপী মহান মানবজাতির ঐক্যের প্রশস্ত পথ। এই নতুন পথে সমগ্র মানবজাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন তিনি। রোম্যাঁ রোল্যাঁ তাঁর গ্রন্থের শেষ বাক্যটিতে যথার্থই লিখেছেন – “In a mortal half-god the perfect incarnation of the principle of life which will lead a new humanity on to a new path.”<sup>88</sup>

### তথ্যসূত্র:

- 1) Romain Rolland, Mahatma Gandhi, Srishti Publishers, New Delhi, 2000, P.2
- 2) ibid, P. 6
- 3) Mohandas Karamchand Gandhi, Stealing and Atonement, The story of my Experiments with Truth an Autobiography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P.31
- 4) ibid, Nirbal ke bala Rame, P.81
- 5) শ্রীমদ মধুসূদন সরস্বতী (সম্পা.), শ্রীমদভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪০ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৬ পৃঃ- ২২৫
- 6) পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক, পৃ. ২৩৩
- 7) Mohandas Karamchand Gandhi, Acauaintance with Religions, The Story of my Experiments with Truth an Autobiography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P.77
- 8) ibid, Christian Contact, P.139
- 9) অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পা.), উপনিষদ, অখণ্ড সংস্করণ, ঈশ উপনিষদ, শ্লোক সংখ্যা - ১, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৭

- 10) Mohandas Karamchand Gandhi, The Bombay Meeting, The story of my Experiments with Truth an Autobiography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P.196
- 11) শ্রীমন মধুসূদন সরস্বতী (সম্পা.), শ্রীমদভগবতগীতা, তৃতীয় অধ্যায়, ৩৫ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৩৪০
- 12) Mohandas Karamchand Gandhi, The story of my Experiments with Truth an Autobiography, The Calm after the storm, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P.218.
- 13) *ibid*, A Tussle with power, P. 307.  
A. L. Basham, The Wonder that was India, Picador, London, 2004, P. 9
- 14) M. K. Gandhi, Harijan, 19 Feb. 1940
- 15) Rabindra Nath Tagore, Uttarayan, 19 Feb. 1940
- 16) M. K. Gandhi, Young India, 18 June, 1925, C.W.M.G., Vol. XXVII, P.255-256.
- 17) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি, (১০৬ সংখ্যক কবিতা, ভারততীর্থ), রবীন্দ্র - রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৭০-৭১
- 18) M. K. Gandhi, Young India, 18 June, 1925, C.W.M.G., Vol XXVII, P.255-256.
- 19) M. K. Gandhi, Young India, 9 March 1929, Speech at Public Meeting, Rangoon, Amrit Bazar Patrika, 10 March, 1929, Mahatma Gandhi, The Essential Writings, Oxford World's Classics, Oxford University Press, New York, 2008, P.19
- 20) M.K. Gandhi, Speech at All-India Congress Committee meeting held on Sep. 15, 1940 D.G. Tendulkar, Mahatma, The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi, Vol. V, 1962, P. 322, C.W.M.G., LXXIII, 1940, P 17
- 21) M.K. Gandhi, Young India, 28 Aug. 1924, C.W.M.G. (The Collected Works of Mahatma Gandhi), Vol. XXV, P. 179-180
- 22) M.K. Gandhi, My Mission, Young India, 3 Apr, 1924, Mahatma Gandhi, The Essential Writings, Edited by Judith M. Brown, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, P. 5
- 23) M.K. Gandhi, From a speech at a meeting of missionaries at Jaffna, Young India, 22 December, 1927
- 24) (ক) M.K. Gandhi, Equality of Religions, Weekly letters, to the Satyagraha Ashram, 1930, from Yeravda Mandir, Navajiban Publishing House, Ahmedabad
- 25) M.K. Gandhi, Equality of Religions, Weekly letters, Satyagraha Ashram, 1930 from Yeravda Central Prison, From Yeravda Mandir, Navajiban Publishing House, Ahmedabad
- 26) M.K. Gandhi, Religion a personal matter, 9 August, 1942, Microfilm, NMML, Vol-IX, No. 30, P 261
- 27) M.K. Gandhi, Speech in Ahmedabad, Young India, 27 April, 1921, RU, PP 3-5, Mahatma Gandhi, The Essential Writings, Edited by Judith M. Brown, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, P. 210.

- 28) M.K. Gandhi, Economic Independence, From Speech at Congress Session at Faizpur, 27 Dec, 1936, Mahatma, Vol. IV, 1961, P. 114-115.
- 29) M.K. Gandhi, Economic Equality, Constructive Programme, Its meaning and place, CWMG, Vol. IXXV, PP. 146-166, Mahatma Gandhi The Essential Writings, Edited by Judith M. Brown, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, P. 176
- 30) Mohandas Karamchand Gandhi, At The High School, The Story of my Experiments with Truth An Autobiography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 19
- 31) *ibid*, A Peep into the Household, P. 350
- 32) M.K. Gandhi, From speech at 8<sup>th</sup> session of Hindi Sahitya Sammelan held at Indore on 29 March, 1918, CWMG, Vol. XIV, P. 292-293
- 33) M.K. Gandhi, Hindi and English in the South, From Gandhiji's presidential address at the Hindi Sahitya Sammelan held at Indore in 1935, National Publishing House, Ahmedabad.
- 34) M.K. Gandhi, Navajivan, 28 March, 1926, CWMG, Vol. XXX, P. 195
- 35) M.K. Gandhi, Hindi and English in the South, From Gandhiji's presidential address at the Hindi Sahitya Sammelan held at Indore in 1935, National Publishing House, Ahmedabad
- 36) M.K. Gandhi, Harijan, 9 September, 1938, CWMG, Vol. LXVII, P. 325
- 37) M.K. Gandhi, Indian Home Rule (Hind Swaraj), Edited (With an Introduction), S.R. Mehrotra, Promilla and Co. Publishers, New Delhi and Chicago, 2020, P. 221
- 38) *ibid*
- 39) *ibid*
- 40) *ibid*, P. 220
- 41) Mohandas Karamchand Gandhi, Farewell, The Story of my Experiments with Truth An Autobiography, Om Books International, Noida, Uttar Pradesh, India, 2019, P. 567
- 42) *ibid*, P. 568
- 43) *ibid*, The Khilafat Against Cow Protection? P. 543
- 44) *ibid*
- 45) M.K. Gandhi, Hindu – Muslim Unity, Unity is Strength, Young India, 11 May, 1921, CWMG, Vol. XX, P 89
- 46) M.K. Gandhi, Learning Unity, Young India, 28 July 1921, CWMG, Vol. XX, PP. – 436-439, Mahatma Gandhi The Essential Writings, Edited by Judith M. Brown, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, P. 192
- 47) M.K. Gandhi, 25 September, Young India, CWMG, Vol. XXV. PP. 192-202
- 48) M.K. Gandhi, 9 October 1924, Young India, CWMG, Vol. XXV, P. 224
- 49) Romain Rolland, Mahatma Gandhi, Srishti Publishers, New Delhi, 2000, P. 141